بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মোতাবেক ২৪ তবলীগ, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যেসব সাহাবীর স্মৃতিচারণ ইতঃপূর্বে করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আমি যা বর্ণনা করছিলাম তাতে কিছু বিষয় উল্লেখ করা বাকীছিল। আজও সেই ধারাবাহিকতায় (কিছু কথা) বর্ণনা করব যার মাধ্যমে বদরী সাহাবীদের এই ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ যা আমি করার ইচ্ছা রাখতাম তা সমাপ্ত হবে।

হযরত আমের বিন রবীয়া (রা.) সম্পর্কে লেখা আছে যে, তার পিতার নাম ছিল রবীয়া বিন কা'ব বিন মালেক বিন রবীয়া (রা.)। তার বরাতে কিছু রেওয়ায়েতও পাওয়া যায়। আব্দুল্লাহ্ বিন আমের রবীয়া (রা.) তার মা হযরত উম্মে আব্দুল্লাহ্ লায়লা বিনতে আবু হাসমার বরাতে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, আমরা আবিসিনিয়া অভিমুখে যাত্রা করতে উদ্যত ছিলাম এবং আমের বিন রবীয়া আমাদের কোনো কাজে কোথাও গিয়েছিলেন। এমন সময় হযরত উমর, যিনি তখনো মুশরিক ছিলেন, সেখানে এসে উপস্থিত হন এবং আমার সামনে দাঁড়ান। তার হাতে আমরা চরম অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলাম। হযরত উমর আমাকে জিজ্ঞেস করেন, **'হে উম্মে আব্দুল্লাহ্!** কোথাও যাচ্ছ নাকি?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ! আল্লাহ্‌র কসম! আমরা স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধানে আল্লাহ্‌র জমিনে বেরিয়ে পড়ছি। তোমরা আমাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছ এবং আমাদের ওপর অনেক নিপীড়ন ও নির্যাতন চালিয়েছ!' একথা শুনে হযরত উমর তাকে বলেন, 'আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হোন।' তিনি বলেন, 'আমি সেদিন হযরত উমরের কণ্ঠে এমন বেদনা বা ভাবাবেগ অনুভব করি যা ইতঃপূর্বে কখনো দেখি নি। এরপর হযরত উমর সেখান থেকে চলে যান আর আমাদের যাত্রার বিষয়টি তাকে ব্যথিত করেছিল। তিনি বলেন, ততক্ষণে হযরত আমের নিজের কাজ শেষ করে ফিরে এলে আমি তাকে বলি, 'হে আবু আব্দুল্লাহ্, আপনি কি উমরকে আর তার বেদনার্ত ও বিমর্ষ অবস্থা লক্ষ্য করেছেন?' (হয়তো তিনি তাকে ঘটনাটা বলে থাকবেন।) হযরত আমের (রা.) উত্তর দেন, 'তুমি কি তার মুসলমান হওয়ার আকঙ্খা রাখো?' তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তখন হযরত আমের (রা.) বলেন, 'খাত্তাবের গাধা মুসলমান হতে পারে, কিন্তু সে ব্যক্তি যাকে তুমি এখনই দেখেছ, (অর্থাৎ হযরত উমর,) সে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে না!' হযরত লায়লা (রা.) বলেন, হযরত আমের একথা সেই হতাশার কারণে বলেছিলেন যা হযরত উমরের ইসলামের প্রতি বিরোধিতা ও কঠোরতার কারণে (তার মনে) সৃষ্টি হয়েছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমের বিন রবীয়া (রা.) তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাদেরকে **নাখলা**'র অভিযানে প্রেরণ করেন; (এটি আব্দুল্লাহ্ বিন জাহশ যুদ্ধাভিযান নামেও পরিচিত, এটি বদরের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা।) আমাদের সাথে হযরত আমর বিন সুরাকাও ছিলেন এবং তিনি দীর্ঘকায় ও হালকা-পাতলা গড়নের ছিলেন। পথিমধ্যে তার প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগে, যে কারণে তিনি কুঁজো হয়ে যান, এমনকি আমাদের সাথে চলার শক্তিও রাখতেন না আর পড়ে যান। এই ছিল ক্ষুধার চিত্র। আমরা এক টুকরো পাথর নিয়ে তার

পেটের ওপর রেখে তার কোমরের সাথে শক্ত করে বেঁধে দিই, তখন তিনি আবার আমাদের সাথে হাঁটতে আরম্ভ করেন। আমরা একটি আরব গোত্রের কাছে পৌঁছি যারা আমাদের আতিথ্য করেন। এরপর তিনি চলতে আরম্ভ করেন এবং বলেন, 'আমি মনে করতাম, মানুষের পা তার পেটকে বহন করে, আসলে মানুষের পেট তার পাগুলোকে বয়ে বেড়ায়।' (যখন ক্ষুধা থাকে, অভুক্ত থাকতে হয়, দুর্বলতা থাকে তখন মানুষ হাঁটতেও পারে না।)

হযরত আবু উমামাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একবার হযরত আমের বিন রবীয়াহ্ এবং হযরত সাহল বিন হুনায়েফ (রা.)-কে গোয়েন্দা কর্মের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ৮ম হিজরীতে যাতুস্ সালাসিলের যুদ্ধে হযরত আমের বিন রবীয়াহ্ (রা.) অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর সেই (যুদ্ধে) তার বাহুতে তীর বিদ্ধ হয় ফলে তিনি আহত হয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন আমের তার পিতা হযরত আমের বিন রবীয়াহ্ (রা.)'র বরাতে বর্ণনা করেন যে, একবার মহানবী (সা.) একটি (নতুন) কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জানতে চান, এটি কার কবর? লোকেরা উত্তর দেয়, অমুক মহিলার কবর। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা আমাকে কেন (তার মৃত্যু) সংবাদ দাও নি? লোকেরা বলে যে, আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন তাই আমরা আপনাকে জাগানো সমীচীন মনে করি নি। উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, এমনটি করবে না। আমাকে জানাযার জন্য ডেকো। এরপর মহানবী (সা.) সেখানে কাতার রচনা করিয়ে জানাযার নামায পড়েন, (সেই কবরের সামনে)।

আব্দুল্লাহ্ বিন আমের বর্ণনা করেন যে, তার পিতা হযরত আমের বিন রবীয়াহ্ (রা.) বলেছেন, মহানবী (সা.) যখন আমাদেরকে কোনো সারিয়া বা যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করতেন তখন আমাদের কাছে পাথেয় বা রসদ হিসেবে কেবল এক থলে খেজুর থাকত। সেনাপতি আমাদের মাঝে এক মুষ্ঠি করে খেজুর বণ্টন করতেন। আর ধীরে ধীরে একটি করে খেজুর ভাগে পড়ার অবস্থা সৃষ্টি হতো। (অর্থাৎ ধীরে ধীরে তাও যখন শেষ হওয়ার উপক্রম হতো তখন সফরে এক ব্যক্তি একটি করে খেজুর পেত।) হযরত আব্দুল্লাহ্ বলেন, আমি বললাম, আব্বাজান! একটি খেজুর খেয়ে কী-ইবা পেট ভরতো? তিনি বলেন, হে প্রিয় পুত্র! এমনটি বলো না, কেননা এর গুরুত্ব আমরা তখন বুঝতে পারতাম যখন আমাদের কাছে তাও থাকতো না। (যে উপোস থাকে তাকে জিজ্ঞেস করো, তাকে খেজুরের গুরুত্ব জিজ্ঞেস করো।)

হযরত উমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে যখন ইহুদীদেরকে খয়বার অঞ্চল থেকে বহিস্কার করেন তখন কুরা উপত্যকার জমি তিনি (রা.) যাদের মাঝে বণ্টন করেন তাদের মাঝে হযরত আমের বিন রবীয়াহ্ (রা.)ও ছিলেন। হযরত উমর (রা.) যখন জাবীয়াহ্'তে যান, এটি দামেস্কের শহরতলীর একটি গ্রাম, তখন হযরত আমের তাঁর (রা.) সাথে ছিলেন। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তখন হযরত উমর (রা.)'র পতাকা হযরত আমের (রা.)'র কাছে ছিল। অনুরূপভাবে হযরত উসমান (রা.) যখন হজ্বের উদ্দেশ্যে যান তখন তিনি (রা.) হযরত আমের (রা.)-কে মদীনাতে আমীর মকামী বা নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। হযরত আমের বিন রবীয়াহ্ (রা.)'র মৃত্যু সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে তার (রা.) মৃত্যু হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতের যুগে হয়েছে, আবার কতেকের মতে ৩২ হিজরীতে আবার অনেকের মতে ৩৩ হিজরীতে হয়েছে। কারো মতে ৩৬ হিজরীতে এবং কারো মতে ৩৭ হিজরীতে হয়েছে। আল্লামা ইবনে আসাকিরের মতে ৩২ হিজরী সংক্রান্ত রেওয়ায়েতটি অধিক সঠিক বলে মনে হয়। তার (রা.) মৃত্যু সম্পর্কে এই রেওয়ায়েতও রয়েছে যে, হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদতের পর তিনি (রা.) নিজের বাড়িতেই অবস্থান করতেন, এমনকি

তার (রা.) জানাযা বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত লোকেরা তার (রা.) সম্পর্কে কোনো সংবাদ জানতো না।

আব্দুল্লাহ্ বিন আমের তার পিতা হযরত আমের বিন রবীয়াহ্ (রা.)'র বরাতে বর্ণনা করেন যে, **মহানবী (সা.)-এর যুগে এক ব্যক্তি বনু ফাযারাহ্ (গোত্রের) এক মহিলাকে এক জোড়া জুতা দেন মোহর ধার্য করে বিয়ে করেন। মহানবী (সা.) এই বিয়েকে বৈধ আখ্যা দিয়েছেন।** অর্থাৎ যৎসামান্য যে দেন মোহর নির্ধারণ করেছিলেন তাও বৈধ।

আব্দুল্লাহ্ বিন আমের তার পিতা হযরত আমের বিন রবীয়াহ্ (রা.)'র বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি মহানবী (সা.)-কে সফরকালে রাতের বেলা নিজের উটের পিঠের ওপর নফল পড়তে দেখেছেন। তিনি (সা.) সেদিকেই মুখ করে (নামায) পড়েছিলেন যেদিকে উট তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল। সফরের সময় বাহনের মুখ যেদিকে থাকবে সেদিকে মুখ করে নামায পড়া বৈধ।

হযরত আমের বিন রবীয়াহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে এক অন্ধকার রাতে সফর করছিলাম। আমরা একটি জায়গায় যাত্রা বিরতি দেই। একজন পাথর জড়ো করে এবং নামাযের জন্য জায়গা প্রস্তুত করে আর আমরা সেখানে নামায আদায় করি। সকালে জানা যায় যে, আমাদের মুখ, ক্বিবলার বিপরীত দিকে ছিল, ক্বিবলামুখী ছিল না। আমরা মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! রাতের বেলা আমরা ক্বিবলার বিপরীত দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছি। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'লা আয়াত, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (সূরা আল্ বাকারা: ১১৬) অবতীর্ণ করেন অর্থাৎ, আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই, অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাবে সেদিকেই খোদার বিকাশ (দেখতে) পাবে। (অর্থাৎ ভুলক্রমে যদি হয়েও যায় তাহলে কোনো সমস্যা নেই।) এটিও হতে পারে যে, মহানবী (সা.) এই আয়াতটি এমনিতেই পড়ে শুনিয়ে থাকবেন, সেই সময়ে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক নয়। যাহোক, এটি হালিয়াতুল আউলিয়ার ভাষ্য।

হযরত আমের বিন রবীয়াহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **যে আমার প্রতি এক বার দরূদ প্রেরণ করে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দশ বার দরূদ বা শান্তি প্রেরণ করেন। কাজেই, এখন এটি তোমাদের ইচ্ছা যে, আমার প্রতি কম দরূদ প্রেরণ করবে নাকি বেশি দরূদ প্রেরণ করবে।** অন্য একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আমের বিন রবীয়াহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **যে বান্দাই আমার জন্য শান্তির দোয়া করে, আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে সেই অবস্থায় থাকে ফিরিশ্‌তারা তার জন্য শান্তির দোয়া করে। অতএব এটি বান্দাদের হাতে, চাইলে (তারা) অধিকহারে শান্তির দোয়া করতে পারে আর চাইলে কমও (করতে পারে)।**

অতঃপর পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো **হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.)'র**। হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তার কোনো সন্তান ছিল না। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবী তালহা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, হযরত আনাস (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) তাঁর মামা হযরত হারাম বিন মিলহানকে, যিনি উম্মে সোলায়েমের ভাই ছিলেন, সত্তর জন আরোহীর সাথে বনু আমের (গোত্রের) অভিমুখে প্রেরণ করেন। আমের বিন তোফায়েল মুশরিকদের নেতা ছিল, যে মহানবী (সা.)-কে তিনটি বিষয়ের মধ্যে একটি গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছিল। সে বলেছিল, শহরবাসীরা আপনার হবে আর গ্রামবাসীরা আমার অথবা এটি যে, আমি আপনার তিরোধানের পর আপনার স্থলাভিষিক্ত

হবো নতুবা আমি গাতফান (গোত্রের) দু'হাজার লোক নিয়ে আপনার ওপর আক্রমণ করবো। এরপর আমের কোন নারীর বাড়িতে প্লেগে আক্রান্ত হয়। বলতে থাকে, এটি তেমনই ফোঁড়ার রোগ যা **'আলে সলূলে'**র এক মহিলার বাড়িতে পূর্ণবয়স্ক উটের হয়েছিল। আমার ঘোড়া নিয়ে আসো। সে এর ওপর আরোহণ করে আর নিজের ঘোড়ার পিঠের পটল তুলে। (এটি তার পরিণতি সংক্রান্ত কথা যা তিনি প্রথমেই বলে দিয়েছেন।) এরপর রেওয়ায়েতে সেই গোত্রেরও উল্লেখ আছে আর এরও (উল্লেখ) আছে যে, হযরত উম্মে সোলায়েমের ভাই হযরত হারাম বিন মিলহান একজন খোঁড়া ও অমুক গোত্রের আরেক ব্যক্তিকে নিজের সাথে নিয়ে বনু আমেরের নিকট যান। হারাম সেই দু'জনকে বলেন, তোমরা কাছাকাছি থেকো, আমি তাদের কাছে যাচ্ছি। যদি তারা আমাকে নিরাপত্তা দেয় তাহলে তোমরা চলে এসো আর যদি আমাকে হত্যা করে তাহলে তোমরা নিজেদের সঙ্গীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে জানিও। হযরত হারাম (রা.) আমেরের কাছে গিয়ে বলেন, তুমি কি আমাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে, যাতে আমি মহানবী (সা.)-এর বাণী পৌঁছে দিতে পারি? একথা বলে তিনি তার সাথে আলোচনা করতে থাকেন। গোত্রের লোকেরা এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে, সে তার পেছন থেকে আসে এবং তাকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করে যা তার দেহ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। হযরত হারাম (রা.) ক্ষতস্থান থেকে বের হওয়া রক্ত হাতে নেন আর নিজের চেহারায় মাখতে মাখতে বলেন, **আল্লাহু আকবর, ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা**। অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। কা'বার প্রভুর কসম, আমি আমার লক্ষ্য অর্জন করেছি। এরপর তারা দ্বিতীয় ব্যক্তির পিছু ধাওয়া করে এবং তাকে হত্যা করে। আর এরপর গিয়ে বাকি ক্বারীদের ওপর আক্রমণ করে আর তারা সবাই নিহত হন, সেই খোঁড়া ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেছিল। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি সেই কথা অবতীর্ণ করেন। এরপর এর চর্চা বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের জাতিকে জানিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকেও সন্তুষ্ট করেছেন। তখন মহানবী (সা.) ত্রিশ দিন পর্যন্ত প্রতি সকালে তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করতে থাকেন। অর্থাৎ **রে'ল, যাকওয়ান, বনু লেহইয়ান এবং উসাইয়্যার** বিরুদ্ধে (দোয়া করেন) যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত।

হযরত আনাস বর্ণিত বুখারীর আরেকটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী বর্শার পরিবর্তে তাকে বল্লম মারা হয়েছিল। আরেকটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.) এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে এই বনি সুলায়েম এর দুটি গোত্র রে'ল এবং যাকওয়ানের বিরুদ্ধে দোয়া করতে থাকেন। হযরত আনাস বলেন, এটি (দোয়া) কুনূতের সূচনা ছিল। এর পূর্বে আমরা (দোয়া) কুনূত (পাঠ) করতাম না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হাফিযদের শাহদতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে সাহাবীদের কুরবানীর প্রেরণার প্রেক্ষিতে বলেন, ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে, সাহাবীরা এমন উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধে যেতেন যে, তারা মনে করতেন, যুদ্ধে শহীদ হওয়া তাদের জন্য পরম প্রশান্তি ও আনন্দের কারণ। আর লড়াইয়ে তাদের কোনো কষ্ট হলে তারা সেটিকে কষ্ট মনে করতেন না বরং সুখ মনে করতেন। যেমন ইতিহাসে সাহাবীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত এরূপ বহু ঘটনা দেখা যায় যে, তারা খোদার পথে নিহত হওয়াকেই নিজেদের জন্য পরম প্রশান্তি জ্ঞান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ সেসব হাফিয যাদেরকে মহানবী (সা.) মধ্য আরবের একটি গোত্রের কাছে তবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন, তাদের

মাঝে হারাম বিন মিলহান (রা.), ইসলামের বাণী নিয়ে আমের গোত্রের নেতা আমের বিন তোফায়েলের কাছে যান আর বাকি সাহাবীরা পিছনে অবস্থান করেন। শুরুতে আমের বিন তোফায়েল এবং তার সঙ্গীরা কপটতামূলকভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু তিনি যখন আশ্বস্ত হয়ে বসে পড়েন আর তবলীগ করা আরম্ভ করেন তখন তাদের মধ্য থেকে কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির লোক এক কুচক্রীকে ইঙ্গিত করে আর ইঙ্গিত পেতেই সে হারাম বিন মিলহানের ওপর পিছন দিক থেকে বর্শার আঘাত করে এবং তিনি পড়ে যান। আর পড়া মাত্রই তার মুখ দিয়ে অবলীলায় এই বাক্য বের হয় যে, **আল্লাহু আকবর, ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা**। অর্থাৎ কা'বার প্রভুর কসম, আমি নাজাত পেয়ে গেছি বা সাফল্য অর্জন করেছি। এরপর সেই দুষ্কৃতকারীরা বাকি সাহাবীদের অবরুদ্ধ করে তাদের ওপরও আক্রমণ করে। সেই সময় হযরত আবু বকরের মুক্ত ক্রীতদাস আমের বিন ফুহায়রা, যিনি হিজরতের সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন, তার সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে যে, বরং তার হত্যাকারী যে পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে যায়, সে নিজের মুসলমান হওয়ার কারণ এটিই উল্লেখ করত যে, আমি যখন আমের বিন ফুহায়রাকে শহীদ করি তখন তার মুখে অবলীলায় **ফুযতু ওয়াল্লাহ্** উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ খোদার কসম! আমি নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। এসব ঘটনা বলে যে, সাহাবীদের জন্য মৃত্যু দুঃখের পরিবর্তে আনন্দের কারণ ছিল।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের একটি উদ্বৃতি উপস্থাপন করছি, (কেননা) এটি অধিক বিস্তারিত। এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন,

এক ব্যক্তি আবু বারা আমেরী, যে মধ্য আরবের গোত্র বনু আমেরের একজন নেতা ছিল, মহানবী (সা.)-এর সমীপে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হয়। তিনি (সা.) একান্ত কোমলভাবে ও স্নেহের সাথে তার কাছে ইসলামের তবলীগ করেন। আর সে-ও বাহ্যত একান্ত উৎসাহ ও আগ্রহের সাথে তাঁর বক্তব্য শোনে, কিন্তু মুসলমান হয়নি। অবশ্য সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে এই নিবেদন করে যে, আপনি আমার সাথে আপনার কতিপয় সাহাবীকে নাজাদে প্রেরণ করুন যারা সেখানে গিয়ে নাজাদবাসীদের কাছে ইসলামের তবলীগ করবে। আর আমি আশা করি, নাজাদবাসীরা আপনার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবে না। তিনি (সা.) বলেন, নাজাদবাসীদের আমি বিশ্বাস করি না। আবু বারা বলে যে, আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না, আমি তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আবু বারা যেহেতু একটি গোত্রের নেতা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল তাই তিনি (সা.) তার দেয়া নিশ্চয়তায় কথা বিশ্বাস করেন এবং সাহাবীদের একটি দল নাজাদে প্রেরণ করেন।

এটি ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত। বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রে'ল এবং যাকওয়ান গোত্র প্রমুখ যারা প্রসিদ্ধ গোত্র বনু সুলায়েম এর শাখা ছিল, তাদের কতিপয় লোক মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় এবং ইসলাম গ্রহণের কথা বলে নিবেদন করে যে, আমাদের জাতির মধ্য থেকে যারা ইসলামের শত্রু তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্যার্থে, কিছু লোক প্রেরণ করা হোক। তিনি লেখেন এখানে তবলীগি নাকি সামরিক সাহায্য তা উল্লেখ নেই, কিন্তু যাহোক তারা বলে যে, আমাদের সাহায্যার্থে কিছু লোক প্রেরণ করা হোক। এতে তিনি (সা.) এই ছোট্ট দলটি প্রেরণ করেন। এই উভয় রেওয়ায়েতের সামঞ্জস্যবিধানের উপায় এটি হতে পারে যে, রে'ল ও যাকওয়ানের লোকদের সাথে আমের গোত্রের নেতা আবু বারা আমেরীও হয়ত এসে থাকবে এবং সে তাদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে থাকবে। যেমন ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর একথা বলা যে,

নাজাদবাসীদের পক্ষ থেকে আমি আশ্বস্ত বোধ করি না। আর এরপর তার এই উত্তর দেয়া যে, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, আমি এর নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আপনার সাহাবীদের কোনো ক্ষতি হবে না– এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, আবু বারা'র সাথে রে'ল ও যাকওয়ানের লোকেরাও এসে থাকবে যাদের কারণে মহানবী (সা.) চিন্তিত ছিলেন। বাকি আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। যাহোক মহানবী (সা.) চতুর্থ হিজরী সনের সফর মাসে মুনযের বিন আমর আনসারীর নেতৃত্বে সাহাবীদের একটি দল প্রেরণ করেন। এদের অধিকাংশ আনসারদের অন্তর্ভুক্ত ছিল আর সংখ্যা ছিল ৭০ আর তাদের প্রায় সবাই ক্বারী ছিলেন। যারা দিনের বেলা জঙ্গল থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করে সেগুলো বিক্রি করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতেন আর রাতের বড় অংশ ইবাদতে অতিবাহিত করতেন। যখন তারা সেই স্থানে পৌঁছেন যা একটি কুয়ার কারণে বে'রে মঊনা নামে প্রসিদ্ধ ছিল, তখন তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হারাম বিন মিলহান, যিনি আনাস বিন মালেকের মামা ছিলেন, মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে ইসলামের বার্তা নিয়ে আমের গোত্রের নেতা ও আবু বারা আমেরীর ভাতুষ্পুত্র আমের বিন তোফায়েলের কাছে যান আর বাকি সাহাবীরা পিছনে অবস্থান করেন। হারাম বিন মিলহান যখন মহানবী (সা.)-এর দূত হিসেবে আমের বিন তোফায়েল এবং তার সঙ্গীদের কাছে পৌঁছেন তখন তারা প্রথমে কপটতামূলকভাবে আতিথ্য করে। কিন্তু তিনি যখন আশ্বস্ত হয়ে বসে পড়েন আর ইসলামের তবলীগ আরম্ভ করেন তখন তাদের মধ্য থেকে কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির লোক কোনো এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত দিলে সে এই নিরপরাধ দূতকে পিছন দিক থেকে বর্শা মেরে সেখানেই হত্যা করে ফেলে। তখন হারাম বিন মিলহানের মুখে এই বাক্য ছিল, **আল্লাহু আকবর, ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা**। অর্থাৎ আল্লাহু আকবর (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ), কা'বার প্রভুর কসম! আমি নিজ লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। আমের বিন তোফায়েল মহানবী (সা.)-এর দূতকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এরপর নিজ গোত্র বনু আমেরের লোকদের উত্তেজিত করে যেন তারা মুসলমানদের অবশিষ্ট দলের ওপর আক্রমণ করে। কিন্তু তারা এতে অস্বীকৃতি জানায় আর বলে যে, আমরা আবু বারা'র নিশ্চয়তা থাকা অবস্থায় মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করব না। এতে আবু আমের বুখারীর রেওয়ায়েত অনুসারে সুলায়েম গোত্র থেকে বনু রে'ল ও যাকওয়ান এবং উসাইয়্যা প্রভৃতি থেকে যারা প্রতিনিধি দল হয়ে এসেছিল, তাদেরকে নিজের সাথে নেয় এবং তারা সবাই মিলে মুসলমানদের এই স্বল্পসংখ্যক ও অসহায় দলের ওপর আক্রমণ করে। মুসলমানরা যখন এই হিংস্র পশুদের তাদের দিকে আসতে দেখে তখন তাদেরকে বলে যে, তোমাদের সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। আমরা তো আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে একটি কাজের জন্য এসেছি এবং আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসিনি। কিন্তু তারা কোনো কথা শুনে নি আর সবাইকে তরবারি দ্বারা হত্যা করে। উপস্থিত সাহাবীদের মধ্য থেকে কেবল এক ব্যক্তি প্রাণে রক্ষা পায় যার পা খোঁড়া ছিল আর সে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেছিল। সেই সাহাবীর নাম ছিল কা'ব বিন যায়েদ। আর কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কাফিররা তার ওপরও আক্রমণ করেছিল যাতে তিনি আহত হন আর কাফিররা তাকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে যায়। কিন্তু আসলে তিনি জীবিত ছিলেন এবং তিনি প্রাণে রক্ষা পান।

যাহোক সাহাবীদের এই দল থেকে দুই ব্যক্তি অর্থাৎ আমর বিন উমাইয়্যা যামরী আর মুনযের বিন মুহাম্মদ তখন উট ইত্যাদি চরানোর জন্য নিজ দল থেকে পৃথক হয়ে এদিক-ওদিক চলে গিয়েছিলেন। তারা দূর থেকে নিজেদের সাময়িক অবস্থানস্থলের প্রতি দৃষ্টি দিলে

দেখতে পান যে, দলে দলে পাখি সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছে। মরুভূমির এসব ইঙ্গিত তারা খুব ভালোভাবে বুঝতেন। তাৎক্ষণিকভাবে তারা বুঝতে পারেন যে, কোনো লড়াই হয়েছে। ফিরে আসলে অত্যাচারী কাফিরদের হত্যাযজ্ঞের নির্মম কর্মকাণ্ড তাদের চোখের সামনে ছিল। দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে তারা তাৎক্ষণিকভাবে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে পরস্পর পরামর্শ করেন। একজন বলেন, আমাদের এখান থেকে তাৎক্ষণিকভাবে পলায়ন করা উচিত আর মদিনায় পৌঁছে মহানবী (সা.)-কে অবগত করা উচিত। কিন্তু দ্বিতীয়জন এই মত গ্রহণ করেননি এবং বলেন যে, আমি সেই স্থান ছেড়ে পলায়ন করব না যেখানে আমাদের আমীর মুনযের বিন আমর শহীদ হয়েছেন। অতএব তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে লড়াই করেন এবং শহীদ হন। আর দ্বিতীয়জনকে, যার নাম ছিল আমর বিন উমাইয়্যা যামরী, কাফিররা ধরে বন্দি করে নেয়। হয়ত তাকেও হত্যা করে ফেলত কিন্তু যখন তারা জানতে পারে যে, সে মুযের গোত্রের সদস্য তখন আমের বিন তোফায়েল আরবের রীতি অনুযায়ী তার ললাটের কিছু চুল কেটে নিয়ে তাকে মুক্ত করে দেয় এবং তাকে বলে যে, আমার মা মুযের গোত্রের এক দাসকে মুক্ত করার মানত করে রেখেছেন। আমি তোমাকে সেটির বিনিময়ে ছেড়ে দিচ্ছি। মোটকথা সেই ৭০জন সাহাবীর মধ্য থেকে কেবল দুই ব্যক্তি রক্ষা পান। একজন ইনিই অর্থাৎ আমর বিন উমাইয়্যা যামরী আর দ্বিতীয়জন হলেন কা'ব বিন যায়েদ যাকে কাফিররা মৃত মনে করে ফেলে রেখে গিয়েছিল।

বে'রে মঊনার ঘটনায় শাহাদতবরণকারী সাহাবীদের মাঝে হযরত আবু বকরের মুক্ত ক্রীতদাস এবং দীর্ঘকাল থেকে ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব আমের বিন ফুহায়রাও ছিলেন। তাকে এক ব্যক্তি জব্বার বিন সালামা হত্যা করেছিল। জব্বার পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে যায় আর সে নিজের মুসলমান হওয়ার কারণ এটি বর্ণনা করত যে, যখন আমি আমের বিন ফুহায়রাকে শহীদ করি তখন তার মুখ থেকে অবলীলায় এই বাক্য বের হয় যে, **ফুযতু ওয়াল্লাহ্**। অর্থাৎ খোদার কসম, আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। জব্বার বলেন, আমি এই বাক্য শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য হই যে, আমি তো এই ব্যক্তিকে হত্যা করেছি আর সে বলছে যে, আমি লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। এটি কেমন কথা! অতএব আমি পরবর্তীতে মানুষের কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, মুসলমানরা খোদার পথে প্রাণ বিসর্জন দেয়াকে সবচেয়ে বড় সাফল্য মনে করে আর আমার মনে এই কথার এমন প্রভাব পড়ে যে, অবশেষে এই প্রভাবেরই অধীনে আমি মুসলমান হয়ে যাই। মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের কাছে রজী' এবং বে'রে মঊনার ঘটনার সংবাদ প্রায় একই সময়ে পৌঁছে আর তিনি (সা.) এতে প্রচণ্ড কষ্ট পান। যেমন বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, এমন কষ্ট পূর্বেও তিনি পান নি আর পরেও পান নি। সত্যিকারঅর্থেই প্রায় আশিজন সাহাবীর এভাবে প্রতারণার শিকার হয়ে নিহত হওয়া, আর সাহাবীও তারা যাদের অধিকাংশ কুরআনের হাফেযদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং এক দরিদ্র নিঃস্বার্থ শ্রেণির সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল। আরবের হিংস্র রীতিনীতির নিরিখেও এটি কোনো সাধারণ বিষয় ছিল না। এছাড়া স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর জন্য তো এ সংবাদ ৮০জন পুত্র সন্তানের মৃত্যুসংবাদের নামান্তর ছিল, বরং এর চেয়েও বেদনাদায়ক। কেননা একজন জাগতিক মানুষের কাছে জাগতিক সম্পর্ক যতটা না প্রিয় হয় তার তুলনায় একজন আধ্যাত্মিক মানুষের জন্য আধ্যাত্মিক সম্পর্ক নিশ্চিতভাবে অনেক বেশি প্রিয় হয়ে থাকে। অতএব এই দুর্ঘটনা দুটির ফলে মহানবী (সা.) ভীষণভাবে মর্মাহত হন। কিন্তু ইসলামে যেহেতু সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণের নির্দেশ রয়েছে তাই তিনি (সা.) এ সংবাদ শুনে إِنَّا

لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়েন আর هذا عمل أبي براء قد كنت لهذا كارها متخوفا অর্থাৎ এটি হলো আবু বারার কর্মকাণ্ডের ফল, অন্যথায় আমি তো এদেরকে পাঠানো পছন্দ করতাম না আর নাজাদবাসীর পক্ষ থেকে আমার আশংকা ছিল– একথা বলে চুপ হয়ে যান।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো হযরত সা'দ বিন খওলা (রা.)'র। তিনি বনু মালেক বিন হাসল বিন আমের বিন লুই গোত্রের সদস্য ছিলেন। কারো কারো মতে তিনি বনু আমের গোত্রের মিত্র ছিলেন। বাস্তবে তিনি একজন পারসিক ছিলেন, কিন্তু পরে ইয়ামেনে এসে বসতি স্থাপন করেন। আমের বিন সা'দ তার পিতা সা'দ বিন ওয়াক্কাসের বরাতে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন– মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জের সময় আমার অসুস্থাবস্থায় আমাকে দেখতে আসেন। সেই অসুস্থতার সময় আমি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিলাম। তখন আমি নিবেদন করি, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমার অসুস্থতা কোন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তা আপনি দেখছেন। আমি একজন সম্পদশালী মানুষ আর আমার উত্তরাধিকারী বলতে আমার একমাত্র কন্যা ছাড়া আর কেউ নেই। আমি কি দুই–তৃতীয়াংশ সম্পদ (আল্লাহ্‌র পথে) দান করে দিতে পারি? তিনি (সা.) উত্তর দেন, না। তিনি (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, তাহলে কি আমি এর অর্ধেক দান করতে পারি? তখন তিনি (সা.) বলেন, না, তুমি এক–তৃতীয়াংশ (দান) করে দাও আর এটিও অনেক। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তোমার উত্তরাধিকারীদের সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া (এরূপ) অভাবী অবস্থায় রেখে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম যে, তারা মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়াবে। অথচ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের আশায় যাকিছুই তুমি ব্যয় করবে সেটির প্রতিদান তোমাকে দেয়া হবে, এমনকি তুমি যদি তোমার স্ত্রীর মুখে একটি লোকমাও তুলে দাও সেটিরও প্রতিদান রয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তাহলে কি আমি আমার সঙ্গীদের পিছনে রয়ে যাব? আমি কি এখানে মৃত্যু বরণ করব? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি পিছনে পড়ে থাকবে না বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশায় তুমি যে পুণ্যকর্মই করবে সেটির মাধ্যমে তুমি সম্মান ও পদমর্যাদায় উন্নতি করবে আর অসম্ভব নয় যে, তুমি পিছনে রয়ে যাবে। অর্থাৎ তোমাকে দীর্ঘ জীবন দেয়া হবে আর বিভিন্ন জাতির লোকেরা তোমার মাধ্যমে উপকৃত হবে এবং কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্তও হবে। এরপর তিনি (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! আমার সাথীদের হিজরত পূর্ণ করো এবং তাদেরকে তাদের গোড়ালীতে ফিরিও না। বর্ণনাকারী বলেন, কিন্তু হযরত সা'দ বিন খওলার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.) দুঃখ প্রকাশ করেন কেননা হিজরতের পর তিনি মক্কায় মৃত্যু বরণ করেছিলেন। এক রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) সা'দ বিন খওলা (রা.)'র জন্য আক্ষেপ করতেন, কেননা তিনি মক্কায় মৃত্যু বরণ করেছিলেন। এর কারণ হলো, যে মক্কা থেকে হিজরত করেছে তার জন্য মহানবী (সা.) অপছন্দ করতেন, সে সেখানে ফিরে আসুক কিংবা সেখানে হজ্জ ও উমরা করার পর অধিক সময় অবস্থান করুক।

ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ বিন সা'দ (রা.)'র পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) সায়েব বিন উমায়ের আল কারী (রা.)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, সা'দ বিন খাওলা যদি মক্কায় মৃত্যু বরণ করে তাহলে যেন তাকে মক্কায় দাফন করা না হয়। কিন্তু অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, সে যদি মক্কায় মৃত্যু বরণ করে তাহলে তাকে যেন মক্কায় দাফন করা না হয়।

হযরত সা'দ বিন খাওলা (রা.) যখন বিদায় হজ্জের সময় মৃত্যু বরণ করেন তখন তার স্ত্রী অন্তসত্ত্বা ছিলেন। তার মৃত্যুর পর (তখনও) বেশি দিন অতিবাহিত হয় নি (এমন

সময়) তার সন্তান প্রসব হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রসবের দিন ঘনিয়ে আসে [সা'দ বিন খাওলা (রা.)'র] মৃত্যুর কিছুদিন পরই সন্তান ভূমিষ্ট হয়। রেওয়ায়েত রয়েছে, ২৫ রাত বা এরচেয়েও কম সময় পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। নিফাস তথা প্রসূতির দৈহিক অপরিচ্ছন্নতার লক্ষণাবলী যখন কেটে যায় তখন তিনি বিয়ের প্রস্তাবদাতাদের উদ্দেশ্যে সুসজ্জিত হন তখন তার কাছে বনি আব্দেদ্ দারের এক ব্যক্তি আবু সানাবেল বিন বাকিক এসে তাকে বলেন, ব্যপার কী আমি তোমাকে সাজসজ্জা করা অবস্থায় দেখছি? হয়তো তোমার বিয়ে করার ইচ্ছে আছে? আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তো ৪ মাস ১০দিন অতিবাহিত করার পূর্বে বিয়ে করতে পারবে না। সুবাইয়া বলেন, তিনি আমাকে একথা বললে সন্ধ্যার সময় আমি কাপড় পরিবর্তন করে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই এবং তাঁর কাছে আমি এবিষয়ে জানতে চাই। তখন তিনি (সা.) আমাকে ফতওয়া দেন, যেহেতু আমি সন্তান প্রসব করেছি
তাই আমার সাথে বৈধভাবে বিয়ে হতে পারে আর আমাকে বলেন, আমি চাইলে এখন বিয়ে করতে পারি। এখান থেকে কিছু মসলা মসায়েল সম্পর্কেও জানা যায়।

এখন হযরত আবুল হায়সাম বিন আত্যাইয়েহান (রা.)'র তাঁর স্মৃতিচারণ হবে। তার ভাইয়ের নাম হযরত উবায়েদ বিন উবায়েদ অথবা হযরত আতীক বিন আত্যাইয়েহান ছিল যিনি [মহানবী (সা.)-এর উপস্থিতিতে সংঘটিত] উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আবুল হায়সাম (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, আমি সর্বপ্রথম বয়আত করেছি। (নিবেদন করি,) আমরা কীভাবে আপনার নিকট বয়আত করব? তখন মহানবী (সা.) বলেন, সেই শর্তে তোমরা আমার হাতে বয়আত করো যে শর্তে বনি ইসরাঈল হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে বয়আত করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আবুল হায়সাম এবং হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.)-কে বনি আব্দে আশআল গোত্রের নেতা নিযুক্ত করেছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি (রা.) দুটি তরবারি ঝুলিয়ে নিতেন, এজন্য তাকে **যুস্ সাইফায়েন** বা দুই তরবারিওয়ালাও বলা হয়ে থাকে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে তিনি হযরত আলী (রা.)'র পক্ষে যুদ্ধে করেন এবং শাহাদত বরণ করেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে হযরত আসেম বিন সাবেত (রা.)'র। মুহাম্মদ নামে হযরত আসেম (রা.)'র একটি পুত্র সন্তান ছিল যার জন্ম হয় হিন্দ বিন মালেকের গর্ভে। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এক আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইমাম রাযী ১৪জন লোক সম্পর্কে নিশ্চিত সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছেন যে উহুদের যুদ্ধে যেসব লোক মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন তারা কোনো অবস্থাতেই মহানবী (সা.)-এর সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। হযরত ইমাম রাযি যেসব নাম লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলোতে মুহাজেরদের মাঝ থেকে হযরত আবু বকর, হযরত আলী [শিয়ারা বলে থাকে কেবল হযরত আলী (রা.) ছিলেন] কিন্তু এখানে হযরত আবু বকর , হযরত আলী, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ, হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস, হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্, হযরত আবু উবায়দা বিনুল জারাহ্ এবং যুবায়ের বিনুল আওয়াম (রা.) ছিলেন আর আনসারদের মাঝ থেকে খাব্বাব বিন মুনযের, হযরত আবু দুজানা, হযরত আসেম বিন সাবেত, হযরত হারেস বিন আস্ সিম্মা, হযরত সাহল বিন হুনায়েফ এবং একইভাবে হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের ও হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) প্রমুখও ছিলেন। এও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ৮জন এমন (সাহাবী) ছিলেন যারা মৃত্যুর কসম খেয়েছিলেন এবং (এদের মধ্যে) ৩জন মুহাজির ছিলেন আর আনসার ছিলেন ৫জন।

বিস্ময়কর বিষয় হলো, ওই সময় যেহেতু মহানবী (সা.)-এর সেবকের প্রয়োজন ছিল তাই যে ৮জন মৃত্যুর কসম খেয়েছিলেন তাদের একজনও শহীদ হন নি। এটি ছিল আল্লাহ্ তা'লার অস্বাভাবিকভাবে তাদেরকে রক্ষা করার দৃশ্য।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো, হযরত সাহল বিন হুনায়েফ আনসারী (রা.)'র। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, বদরের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে ১০০ উট ও উটনী এবং ২টি ঘোড়া ছিল। এগুলোর একটির পিঠে হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.) ছিলেন এবং অন্যটিতে হযরত মুসআব বিন উমায়ের ও হযরত সাহল বিন হুনায়েফ (রা.) ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা পথে পালা করে এসব উটের পিঠে আরোহণ করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.), হযরত আলী এবং হযরত মারসাদ বিন আবি মারসাদ গানভী যিনি হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)'র মিত্র ছিলেন এঁরা সবাই একটি উটে পালা করে আরোহণ করতেন। উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে যারা ছিলেন তাদের মাঝে হযরত সাহল বিন হুনায়েফ (রা.)'র উল্লেখও পাওয়া যায়।

উসায়ের বিন আমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত যে, একবার আমি হযরত সাহল বিন হুনায়েফ (রা.)'র কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে নিবেদন করি, আমার কাছে এমন একটি হাদিস বর্ণনা করুন যা হারুরিয়্যাহ ফিরকা বা খারেজী সম্প্রদায় সম্পর্কে আপনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে শুনে থাকবেন। তিনি (রা.) বলেন, যা আমি শুনেছি এর বাইরে আমি তোমাকে আর কিছুই বলব না। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আমি এমন একটি জাতির কথা উল্লেখ করতে শুনেছি যারা এখান থেকে বের হবে আর তিনি ইরাকের দিকে ইঙ্গিত করেন। সেসব লোক কুরাআন পড়বে ঠিকই কিন্তু তা তাদের হলক তথা কণ্ঠনালীর নীচে নামবে না। তারা ধর্ম থেকে সেভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে তির শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, নবী (সা.) কি এর কোনো লক্ষণ উল্লেখ করেছেন? তখন তিনি উত্তরে বলেন, আমি যা শুনেছিলাম তা এতটুকুই। আমি তোমাকে এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারব না। যে কথা শুনেছিলাম তা বলে দিয়েছি, এখন নিজেই অনুমান করে নাও।

উমায়ের বিন সাঈদ থেকে বর্ণিত, হযরত আলী (রা.) হযরত সাহল বিন হুনায়েফ (রা.)'র জানাযার নামায পড়ান এবং পাঁচ তাকবীর দেন। লোকেরা তখন বলে, এটি কী ধরনের তাকবীর? এর উত্তরে হযরত আলী (রা.) বলেন, ইনি **সাহল বিন হুনায়েফ** যিনি বদরী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত এবং বদরী সাহাবীরা অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন। অতিরিক্ত তাকবীর দিয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমি আপনাদের অবহিত করতে চেয়েছি।

এরপর রয়েছে হযরত জব্বার বিন সাখর (রা.)'র স্মৃতিচারণ। 'বনু তাঈ' গোত্রের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হযরত আলী (রা.)'র যুদ্ধাভিযান যা নবম হিজরী সনের রবিউল আখের-এ সংঘটিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে লেখা আছে, মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে ১৫০জন লোকসহ বনু তাঈ গোত্রের **'ফুল্‌স প্রতিমা'** ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেন। বনু তাঈ অঞ্চল মদীনার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এই অভিযানের জন্য তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে একটি বড় কালো পতাকা এবং একটি ছোটো সাদা পতাকা প্রদান করেন। হযরত আলী (রা.) সকালে হাতেমের লোকজনের ওপর আক্রমন করেন আর তাদের ফুল্‌স প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলেন। হযরত আলী (রা.) বনু তাঈ-এর প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও যুদ্ধবন্দি নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। এই অভিযানে পতাকা ছিল হযরত জব্বার বিন সাখর (রা.)'র হাতে। এই অভিযানে হযরত আলী (রা.) তাঁর সঙ্গীদের কাছে মতামত চাইলে হযরত জব্বার বিন সাখর

বলেন, রাতভর আমরা আমাদের বাহনে বসে সফর করি আর সকাল হতেই তাদের ওপর আক্রমণ করব। তার একথা হযরত আলী (রা.) পছন্দ করেন।

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, **আমি মহানবী (সা.)-এর বাম পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম তখন তিনি আমাকে ধরে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দেন আর এরপর হযরত জব্বার বিন সাখর এলে তিনি (সা.) আমাদের উভয়কে তাঁর পিছনে দাঁড় করিয়ে দেন।**

একটি রেওয়ায়েতে আছে, হযরত উমায়ের ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে আমর বিন আব্দে উদ্দ শহীদ করেছিল। আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে, হযরত উমায়ের ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে আহসান বিন সাঈদ শহীদ করেছিল। সাখর (রা.)'র স্মৃতিচারণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এটি হলো হযরত উমায়ের বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)'র স্মৃতিচারণ। এ রেওয়ায়েতটি তাঁর সম্পর্কে, তাঁকে আমর বিন আব্দে উদ্দ শহীদ করেছিল এবং অন্য একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত উমায়ের বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে আহসান বিন সাঈদ শহীদ করেছিল।

একটি রেওয়ায়েত হলো, ৯ হিজরী সনের সফর মাসে মহানবী (সা.) হযরত কুতবা (রা.) কে ২০জন লোকসহ খাসাম গোত্রের একটি শাখার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যারা তাবালার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করত। তিনি (সা) তাঁকে অতর্কিতে তাদের ওপর আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। এই সাহাবীরা ১০টি উটে আরোহণ করে যাত্রা করেন আর তারা এগুলোতে পালাক্রমে আরোহণ করেন। তারা এক ব্যক্তিকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, কিন্তু সে তাদের সামনে বোবা সাজে কিন্তু সুযোগ পেতেই স্বগোত্রের লোকদের চিৎকার করে সাবধান করতে থাকে, একারণে তারা তাকে হত্যা করে। এরপর হযরত কুতবা এবং তাঁর সাথীরা অপেক্ষা করেন আর যখন তারা অর্থাৎ গোত্রের লোকেরা ঘুমিয়ে পড়ে তখন তারা ভয়বহ আক্রমন রচনা করেন। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় এবং উভয় পক্ষের অনেকেই আহত হয়। হযরত কুতবা (রা.) অনেককে হত্যা করেন এরপর তাদের চতুষ্পদ প্রাণী এবং গবাদিপশু আর মহিলাদেরকে মদীনায় নিয়ে আসেন। খুম্‌স পৃথক করার পর প্রত্যেকের ভাগে চারটি করে উট আসে। তখনকার হিসাব অনুযায়ী একটি উটের বিপরীতে দশটি বকরী বা ছাগল গণ্য করা হতো। ইমাম বাগবী বলেন, হযরত উকবা বিন আমের (রা.)'র বরাতে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি।

যাহোক, সাহাবীদের যে স্মৃতিচারণ করতে চাচ্ছিলাম তা এখানে সমাপ্ত হচ্ছে। এর পাশাপাশি আমি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার অনুরোধ করতে চাই। সেখানে যে কঠিন পরিস্থিতি বিদ্যমান (তা হতে উত্তরণের) দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন আর বিচার বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী এবং খোদা ও তাঁর রসূলের নামে অত্যাচারী লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বিবেক দিন অথবা তাদেরকে পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন। দ্বিতীয়ত বুর্কিনা ফাসোর জন্যও দোয়া করুন, সেখানেও এখনও কঠিন পরিস্থিতি বিরাজমান। উগ্রপন্থী বা কট্টরপন্থী একই কাজ করে চলেছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নামে অত্যাচার করছে। এছাড়া আলজেরিয়ার লোকদের জন্যও (দোয়া করুন), সেখানেও কতক সরকারী কর্মকর্তা অথবা বিচারবিভাগ আহমদীদের ওপর ঘৃণ্য অত্যাচার ও নির্যাতন করে চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে স্বীয় নিরাপত্তার চাদরে আবৃত রাখুন।

বিশেষভাবে দোয়া এবং সদকার প্রতি মনোযোগ দিন। আল্লাহ্ তা'লা বিরোধীদের অনিষ্ট থেকে সকল আহমদীকে রক্ষা করুন।

জুমুআর পর আমি কয়েকজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। এখন তাদের স্মৃতিচারণ করছি।

প্রথম স্মৃতিচারণ শহীদ মোকাররম মুহাম্মদ রশীদ সাহেবের যিনি গুজরাত জেলার ঘুটড়িয়ালা নিবাসী চৌধুরী বিশারত আহমদ সাহেবের সুপুত্র ছিলেন। তাঁকে দুজন আহমদী বিদ্বেষী তার ঘরে এসে ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে গুলি করে শহীদ করে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। শাহাদাতের সময় মরহুমের বয়স হয়েছিল ৭০ বছরের কিছু অধিক। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো, মুকাররম মুহাম্মদ রশীদ সাহেব গুজরাতের ঘুটড়িয়ালায় অবস্থিত নিজ বাড়িতে একা থাকতেন যেখানে তিনি নিজ এলাকার লোকদের সুবিধার্থে ফ্রি হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারি বানিয়েছিলেন যা থেকে গ্রাম এবং আশপাশের লোকেরা উপকৃত হতো। গ্রামের দুজন যুবক ঔষধ নেবার বাহানায় তার ঘরে নির্মিত ডিস্পেন্সারিতে প্রবেশ করে এবং (তাকে উদ্দেশ্য করে) গুলি ছোড়ে। শোনা যাচ্ছে যে, যারা গুলি করেছে তাদের মাঝে একজন কুরআনের হাফিযও ছিল যার একটি গুলি শহীদ মরহুমের মাথায় লাগে যার ফলে মোকাররম মুহাম্মদ রশীদ সাহেব ঘটনাস্থলেই শাহাদত বরণ করেন। ঘটনার পর ঘাতকরা পালিয়ে যায়। শহীদ মরহুমের একজন কর্মচারী কয়েক মিনিট পর ঘটনাস্থলে পৌঁছলে ঘটনার কথা জানাজানি হয়। পার্শ্ববর্তী থানায় ঘটনার মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তীতে তারা বলেছে যে, দুই ঘাতকের একজনের লাশ পাশের ক্ষেতে পাওয়া গেছে যে কিনা কুরআনের হাফিয ছিল। তার মৃত্যুর ব্যাপারে পুলিশ পৃথকভাবে তদন্ত করছে আর অপর ঘাতককে পুলিশ হিফাযতে নেয়া হয়েছে। এখানে অন্ততপক্ষে পুলিশ ঘাতককে নিজেদের হিফাযতে নিয়েছে। শহীদ মরহুমের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মুন্সি সুলতান আলম সাহেব (রা.)'র মাধ্যমে, যিনি গুজরাত জেলার ঘুটড়িয়ালারই অধিবাসী ছিলেন এবং স্থানীয় স্কুলে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ঘুটড়িয়ালা থেকে ১৯০৬ সালে কাদিয়ানে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। শহীদ মরহুম মেট্রিক পাশ করার পর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। কয়েক বছর পর সেনাবাহিনী থেকে ইস্তফা দিয়ে ৮৪ বা ৮৫ সনে পরিবারসহ নরওয়েতে স্থানান্তরিত হন। নরওয়ের নাগরিকত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি ২০০৮ সালে নরওয়ে থেকে নিজের পৈত্রিক বাড়িতে চলে যান এবং নরওয়েতে যাতায়াত ছিল। পৈত্রিক গ্রামে কৃষিকাজের পাশাপাশি স্থানীয় লোকজনের সেবার জন্য ফ্রি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারি আরম্ভ করেছিলেন। এই কাজ শেষ পর্যন্ত চলমান ছিল। শহীদ মরহুম আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। শাহাদতের সময় ঘুটড়িয়ালায় জামা'তের সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করছিলেন। অত্যন্ত মিশুক এবং মানবদরদী ছিলেন। প্রত্যেকের সাথে আপনভাব এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তার সৃষ্টিসেবার চেতনা দেখার মতো ছিল। ধর্মের বাছবিচার না করে অভাবীদের আর্থিক এবং নৈতিক সহায়তা করতেন। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ছিল। অতিথিপরায়ণতা তার বিশেষ গুণ ছিল। বিশেষত কেন্দ্রীয় মেহমানদের সেবায় অগ্রগণ্য থাকতেন। নামাযে নিয়মিত এবং গ্রামের যত্রতত্র ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করতেন। তার ভাতিজা আইভরিকোষ্টের মুরব্বী রাফে আহমদ সাহেব বলেন, শহীদ মরহুম সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এবং সৃষ্টিসেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি একজন উত্তম

দাঈ ইলাল্লাহ্ ও দরিদ্রদের একান্ত সেবক ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার হাতে নিরাময় গুণ দিয়েছিলেন। জুমুআর খুতবা নিয়মিত শোনা এবং এ বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে শহীদ মরহুমের স্ত্রী পারভীন আক্তার সাহেবা নরওয়েতে একটি স্বপ্ন দেখেন যে, শহীদ মরহুমের ওপর আক্রমণ হয়েছে এবং কেউ তার প্রাণনাশের চেষ্টা করছে। যাহোক, তিনি তাকে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য বলেছিলেন। শহীদ মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী পারভীন আক্তার সাহেবা, যিনি বর্তমানে নরওয়েতে আছেন, এবং দুই ছেলে ও পাঁচ মেয়ে রয়েছে যাদের মধ্যে এক মেয়ে পাকিস্তানে আর বাকিরা বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছে।

নরওয়ের মুবাল্লিগ ইনচার্য শাহেদ মাহমুদ কাহলুন সাহেব লিখেন, একান্ত ভদ্র ও সাদা মনের মানুষ ছিলেন। নরওয়েতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মাধ্যমে মানুষের সেবা করতেন আর এখন অবসরের পর প্রায় বারো-তেরো বছর যাবৎ পাকিস্তানে নিজ গ্রামে বসবাস করছিলেন। মানুষের সেবা করছিলেন। এর মাঝে বিভিন্ন সময়ে নরওয়েতে যাতায়াত করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার হাতে নিরাময় গুণ প্রদান করেছিলেন। রোগীদের সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন এবং বাড়িতে গিয়ে পর্যন্ত ঔষধ দিয়ে আসতেন। তার স্ত্রী তার আত্মীয়দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথমে বয়আত করেন নি, কিন্তু নিজের স্বামীর বিরোধিতাও করেন নি বরং সব সন্তানদের বিয়ে আহমদী পরিবারে করিয়েছেন। সর্বশেষ ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে যখন তিনি নরওয়েতে আসেন তখন তার স্ত্রীকেও বয়আত করান এবং বলতেন, আমি এ উদ্দেশ্যেই এসেছি যাতে স্ত্রীকে বয়আত করাতে পারি। তিনি বলেন, পাকিস্তানে বিরোধিতা অনেক বেশি। প্রাণনাশের হুমকিও এসে থাকে, কিন্তু সেখানে দারিদ্রতা অনেক বেশি এবং মানুষ ঔষধ কিনতে পারে না। আমার কারণে দরিদ্ররা ফ্রি চিকিৎসা পাচ্ছে এবং তাদের সাহায্য হচ্ছে। আর আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না– সেটি তো একদিন আসবেই। আহমদীরা তো তবুও সেবা করছে যেন মানবতার সেবা করা হয় এবং নির্দ্বিধায় করছে। আল্লাহ্ তা'লা শহীদ মুকাররম মুহাম্মদ রশীদ সাহেব-এর সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং শহীদ মরহুমের উত্তরসূরীদের ধৈর্য ও সাহস প্রদান করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো, বরং এতে দুজন রয়েছে। তারা হলেন তুরস্কের আলেকজান্দ্রিয়ার (অধিবাসী) মুকাররমা আমানী বাস্‌সাম আজলাভী সাহেবা এবং স্নেহের সালাহ্ আব্দুল মুঈন কুতায়েশ। মুরব্বী সিলসিলা ও জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাদেক সাহেব লিখেন যে, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে তুরস্কে বড় বড় যে দুটি ভূমিকম্প হয়েছিল তাতে দুজন আহমদীও ইন্তেকাল করেন, যারা কিনা মা-ছেলে ছিল, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। এছাড়া সামগ্রিকভাবে ভূমিকম্প থেকে সকল আহমদী আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সুরক্ষিত আছেন, যদিও কয়েকজন ছোটোখাটো আঘাত পেয়েছে। মৃত্যু বরণকারীদের মধ্যে তেইশ বছরের একজন সিরিয়ান আহমদী ভদ্রমহিলা মোকাররমা আমানী বাস্‌সাম আজলাভী সাহেবা আলেকজান্দ্রিয়া জামা'তের সদস্যা ছিলেন। তিনি আব্দুল মুঈন কুতায়েশ সাহেবের স্ত্রী এবং আলেকজান্দ্রিয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট মুকাররম সালাহ্ কুতায়েশ আবু খালেদ সাহেবের পুত্রবধূ ছিলেন। আমানী সাহেবা প্রায় দুই মাস আগে তাঁর স্বামীর সাথে বয়আত করেছিলেন। তাঁর শ্বশুর মুকাররম সালাহ্ কুতায়েশ সাহেব বলেন, ভূমিকম্পের এক দিন আগেই তিনি আমানী সাহেবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি তোমার পরিবারের সদস্যদের (অর্থাৎ পিত্রালয়ে) জানিয়েছো যে, তুমি বয়আত গ্রহণ করেছো? উত্তরে আমানী সাহেবা বলেন, জ্বী, হ্যাঁ। এখন আমি আমার মা-বাবাকে আমার আহমদী হওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছি। সালাহ্ সাহেবের

ভাষ্য হলো, আমানী সাহেবা এর জন্য অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন যে, তার পিতামাতা তার আহমদীয়াত গ্রহণে কোনো কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখায় নি এবং কোনো বিরোধিতাও করেনি। তার সাথে তার তিন বছরের পুত্র স্নেহের সালাহ্ উদ্দীনও মৃত্যু বরণ করে; إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তারা উভয়ে ধ্বংসস্তুপের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিলেন এবং তাদেরকে দু'দিন পর উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। ততক্ষণে তারা মৃত্যু বরণ করেছিলেন। আমানী সাহেবা তার পরিবারে স্বামী মুকাররম আব্দুল মুঈন কুতায়েশ সাহেব ছাড়া ৬ বছরের কন্যা আবীরাকেও রেখে গিয়েছেন। কাবাবীর জামা'তের মুরব্বী সিলসিলাহ শামসুদ্দিন বালাবারি সাহেব বলেন, আমানী সাহেবা এবং তার স্বামী আব্দুল মুঈন কুতায়েশ সাহেবের পরিবার সিরিয়া থেকে হিজরত করে তুরস্কে এসেছিল। আমানী সাহেবা ছিলেন একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী সেবিকা এবং মিতব্যয়ী ভদ্রমহিলা। বয়আতের গুরুত্ব অনুধাবন করার পর তিনি বয়আত করতে বিন্দুমাত্র দেরি করেন নি বরং নিজ স্বামী এবং ভাইদেরকেও উৎসাহ দিতে থেকেছেন। তিনি বলেন, আমার স্ত্রী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিশেষভাবে যে বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন তা হলো, মরহুমা শ্বশুরালয়ের সকল সদস্যদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন আর সবার সাথে অত্যন্ত প্রেম ও ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। বয়আত গ্রহণের দিন তিনি মহা আনন্দিত ছিলেন এবং আমাদেরকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বিদায় জানিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা এবং দয়াসুলভ ব্যবহার করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ, আমি যার গায়েবানা জানাযা পড়াব, তিনি হলেন, মাকসূদ আহমদ মুনীব সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্, যিনি গত ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৫৩ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন; إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তার পিতা মুকাররম চৌধুরী জান মুহাম্মদ সাহেব ১৯৭৪ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ১৯৯১ সালে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়া থেকে মুবাশ্বের ডিগ্রিসহ পাশ করেন। এরপর তিনি কেন্দ্রীয় নাযারাত এসলাহ্ ও এরশাদের অধীনে পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে সেবা প্রদান করেন। ১৯৯৮-২০০৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়াতে সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। অতঃপর পুনরায় পাকিস্তানেই চলে আসেন এবং সম্প্রতি কোয়েটা জেলায় মুরব্বী হিসেবে সেবা করে আসছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি স্ত্রী ছাড়া এক পুত্র এবং দুই কন্যা রেখে গেছেন। নাযের এসলাহ্ ও এরশাদ সাহেবও লিখেছেন যে, অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং বিশ্বস্ততা ও পরিশ্রমের সাথে কর্ম সম্পাদনকারী মুরব্বী ছিলেন।

কোয়েটার মুরব্বী সিলসিলাহ্ আব্দুল উকিল সাহেব লিখেন, তিনি ওয়াক্‌ফে যিন্দেগীদের খুব সম্মান করতেন। মরহুম যে বিষয় জানতেন না নির্দ্বিধায় আমাকে জিজ্ঞেস করতেন অথচ বয়সে আমি তার চেয়ে বেশ ছোট। মরহুম সুদীর্ঘকাল কেনিয়াতে কাটিয়েছেন এবং তার আলাপচারিতায় সর্বদা কেনিয়ার স্মৃতিচারণ অবশ্যই হতো আর কেনিয়া এবং কেনিয়ার অধিবাসীরা যেন তার হৃদয়ে ঘর করে নিয়েছিল। মরহুম প্রায়ই বলতেন যে, কেনিয়ার মানুষ নিষ্ঠায় অনেক এগিয়ে আছে এবং তারা (মানুষকে) অনেক ভালোবাসে।

মজলিসের কায়েদ জনাব ফরিদ মুবারক সাহেব লিখেন, অত্যন্ত সুদর্শন, পবিত্রচেতা, ধর্মের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, জামা'তের জন্য উৎসর্গিত, খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা হৃদয়ে ধারণকারী মানুষ ছিলেন। তিনি বলেন, আমি যখন অবগত হলাম যে, কোয়েটাতে একজন বেশ সিনিয়র মুরব্বির পদায়ন হয়েছে, তখন আমি অনেক আনন্দিত হয়েছি, কারণ

কোয়েটা জামা'তে এটির খুব প্রয়োজন ছিল। তিনি বলেন, প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমার হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। যেদিন তিনি কোয়েটা জেলার মসজিদে প্রথম জুমুআর খুতবা প্রদান করেন, এতে প্রত্যেক শ্রোতা তার অনেক প্রশংসা করে। অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। প্রত্যেককে নিজের ঘরে আসার দাওয়াত দিতেন। মানুষের পূর্ণ সেবা করতেন। তার হৃদয়ে জামা'তের জন্য যে ব্যাকুলতা ছিল তা তার চোখ দেখেই বোঝা যেত। তিনি যখন বক্তৃতা করতেন তখন তাঁর মাঝে এমন আবেগ ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হতো যে, শ্রবণকারীদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতো। বিভিন্ন সভায় ও সফরে অংশ নিতেন আর প্রত্যেক সাক্ষাৎকারীর হৃদয়ে জামা'তের প্রতি আন্তরিকতা সৃষ্টির পূর্ণ চেষ্টা করতেন। জামা'তী জ্ঞানের এক ভরপুর ভাণ্ডার ছিলেন তিনি। তার বিনয় এমন ছিল যে, তিনি বলেন, আমি আমার জীবনে এমন বিনয়ী মানুষ আর দেখি নি। তিনি আরো বলেন, গত জুমুআর দিন (যার পরের দিন তিনি মৃত্যু বরণ করেন সেই জুমুআয়) আমি তার চেহারায় এক ভিন্ন ধরনের নূর বা জ্যোতি প্রত্যক্ষ করেছি। তার চেহারার দিকে আমার দৃষ্টি যখন পড়ে তখন আমি নাযেম উমুমী সাহেবের সামনে মুরব্বি সাহেবকে বলি, আজকে তো আপনাকে অনেক সুন্দর লাগছে। আমার জানা ছিল না যে, এটিই তার শেষ জুমুআ হবে। এর পরের দিনই তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন আর তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। (নামাযের পর) উল্লিখিত সবার গায়েবানা জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)